বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

বিশ্বায়নের প্রভাব এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সামর্থ্য : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ রাশেদ আলম ভূঁইয়া*
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

১। ভূমিকা

পুঁজি এবং অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতা হারাচ্ছে। এ সম্পর্কিত মতামত তদুপরি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য নিয়ে বর্তমানে ব্যাপকমাত্রায় সংশয় বিরাজ করছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বৈশ্বিক বাজারসমূহের একত্রিতকরণ এবং সম্প্রসারণের ফলে পুঁজি একচেটিয়া রূপলাভ করেছে। কেন্দ্রীভূত এবং পুঞ্জিভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি দেশীয় সব সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক রূপলাভ করেছে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে অতীতে যে ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল সেখানে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। দেশীয় শিল্পের রক্ষা এবং বাজার সংরক্ষণের ধারণা বহুলাংশে লোপ পেয়েছে। উন্নয়ন বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী বাজার উন্মুক্তকরণ এবং সম্প্রসারণে তাঁদের অবিরাম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তারা উন্নয়নের যে পরামর্শ বা নির্দেশনা দিচ্ছে তার সারবস্তু হচ্ছে পণ্য চলাচলে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক প্রত্যাহার বা হ্রাস করে বাজার উন্মুক্ত করে দিতে হবে, কৃষিসহ সকল অর্থনৈতিক খাত থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করতে হবে, জনকল্যাণ ব্যয় কমানোসহ রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও ভূমিকা ব্যাপকভাবে সঙ্কুচিত করতে হবে এবং এগুলো করলেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খুব দ্রুতহারে উন্নতি সাধিত হবে। এ সকল শর্ত এবং নির্দেশ মানতে গিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লোপ পাচ্ছে, উন্নয়ন রাষ্ট্রের ধারণা তথা রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন- মহাশক্তিধর বাজার ব্যবস্থা কি রাজনীতিবিদদের ক্ষমতাহীন করে ফেলছে? এবং অনেকেই বিশ্বায়নের উত্থানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতাহীনতার অনিবার্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য অভিনব এবং আকর্ষণীয় কতকগুলো ধারণার জন্ম দেয়া হয়েছে। যেমন- The End of the Nation-State বা জাতি রাষ্ট্রের পরিসমাপ্তি, The Retreat of the State বা রাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণ, The End of the Sovereignty বা সার্বভৌমত্বের পরিসমাপ্তি, 'The Shrinking State'বা সঙ্কুচিত রাষ্ট্র ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে এ প্রত্যয়গুলো বিশ্বায়ন ও জাতি-রাষ্ট্রসমূহের জটিল সম্পর্কের কিছুটা ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, বহুজাতিক পুঁজির দুর্দান্ত প্রতাপ জাতি-রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সামনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে বহুজাতিক পুঁজি তার আপন স্বার্থে স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই বলে এমন ধারণা করা নিতান্তই ভুল হবে, জাতি-রাষ্ট্রের অবসান ঘটতে চলেছে বা জাতি-রাষ্ট্র অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যদিও আমাদের মনে হচ্ছে শাসন প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক সন্ধিক্ষণ চলছে। কিন্তু এ সঙ্কটের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি অস্পষ্ট। রাষ্ট্র কি পিছু হটছে বা সঙ্কুচিত হচ্ছে

*এমএসএস ও এমফিল ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। লেখকদ্বয় সার্বিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য বিআইডিএস-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

কিনা? এটা যৌক্তিকভাবে বিশেণ্ডষণ করার অবকাশ রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী সকল যুগে রাষ্ট্রের গঠন এবং কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সময়ের আবর্তে কিছু প্রতিষ্ঠানের গুর"ত্ব হ্রাস পেয়েছে। এ লেখাতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে, শাসন-সংক্রান্ড় বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকবে। রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপমাত্রই খারাপ আর বাজার হলো অপ্রতিরোধ্য- এ ধারণার বিপরীতে খুঁজে দেখা হয়েছে, কি ধরনের কৌশল, নীতিমালা ও আইন-কানুন প্রণয়ন করলে বাজার এবং রাষ্ট্র উভয়কেই গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক করা যায়। কেননা নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য এটা খুবই গুর"ত্বপূর্ণ।

২। বিশ্বায়নের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বিশ্বায়নের সর্বাধিকভাবে ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি হচ্ছে- 'বিশ্ব অর্থনীতিতে জাতি রাষ্ট্রগুলোর ক্রমাগত একীভূতকরণ। ১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বায়ন সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মূলত বিশ্বায়ন শাস্ত্র বুদ্ধিভিত্তিক গ" পেরিয়ে, নব উদার অর্থনৈতিক নীতি দ্বারা একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে যেটাকে জর্জ ডবিণ্ডউ বুশ "নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা" বলেছেন। বিশ্বায়ন একটি বহুমাত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সমষ্টি যা প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিক্রমায় গড়ে উঠেছে।

ফুয়েন্ড়সের মতে, বিশ্বায়ন হচ্ছে- ক্ষমতারই এক নতুন ব্যবস্থা (পাওয়ার সিস্টেম)। Thomas Friedman একটি সংক্ষিপ্ত এবং সহজবোধ্য সংজ্ঞায় বিশ্বায়নের সাধারণ প্রবণতার ওপর গুর"ত্বারোপ করে বলেন, "এটা হলো বাণিজ্য, অর্থ ও তথ্যের একত্রীকরণ যা একক বিশ্ববাজার ও সংস্কৃতি তৈরি করেছে।" বুদ্ধিভিত্তিক মহলে বিশ্বায়ন তথা সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির একত্রীকরণের প্রবণতাকে বোঝাতে নানা ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন- Globality, Globaloney, Internationalization বা আন্ড়র্জাতিকীকরণ, Universalization বা বৈশ্বিকীকরণ, Westernization বা পশ্চিমীকরণ, Americanization, Transnationalization বা বহুজাতিকীকরণ, Deterritorialization বা বি-পরিসীমাকরণ ইত্যাদি। মার্শাল ম্যাকলোহানের মতে, 'Global Village' ধারণার পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন সর্বজনীনতা এবং স্থানিকতার পার্থক্য দূর করে সময় এবং স্থানের বর্গকে অবলুপ্ত করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিময়তা জাতীয় সীমারেখাকে অতিক্রম ও পুন:অতিক্রম করে। এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ড় ফল হিসেবে দেখা হয় অর্থনৈতিক বৈশ্বিকতা (Economic Globality) যা পণ্য ও সেবার সম্পূর্ণ এবং সীমাহীন বিনিময় তৈরি করেছে। ভৌগোলিক সুবিধার বিবেচনায় উৎপাদনকে আঞ্চলিকীকরণ করা হয়েছে। বিনিয়োগ ঘটছে জোটভুক্ত ব্যবস্থায় ও উৎপাদন সংস্থার মাধ্যমে। অর্থ বাজার রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে হয়েছে বৈশ্বিক এবং সম্পূর্ণ বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রেই ঘটেছে। Mittelman (2000:235)-এর মতে, বিশ্বায়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার নতুন ধরনের তীব্রতা যাকে তিনি বলেছেন এক ধরনের অস্বাভাবিক ও অতিমাত্রিক প্রতিযোগিতা যেখানে বিশ্বের এক প্রান্ড়ের গৃহীত সিদ্ধান্ড়সমূহ বিশ্বের যেকোনো প্রান্ড়ের সিদ্ধান্ড়ের ওপর প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন যে, এ প্রক্রিয়ার মৌলগত দিক হচ্ছে পুঁজির কাঠামোগত ক্ষমতার কর্তৃত্ব যা রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়াটি অপ্রতিরোধ্য যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় টিকে আছে এবং এখানে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হচ্ছে বাজার পতন রোধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বায়ন রাষ্ট্রের স্বশাসন এবং নিয়ন্ত্রণধর্মী ক্ষমতাকে হ্রাস করেছে এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা শব্দটি আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অর্থে এখন আর অর্থবহ ভাবে কার্যকর নয়। দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র অভ্যন্ড়রীণভাবে এবং

বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন পাবলিক, প্রাইভেট এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের কাছে কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিচ্ছে। এ যুক্তির চূড়ান্ড় পর্যায়ে বলা হয় যে, জাতি রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিকভাবে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষতে পরিণত হয়েছে। এবং রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভূখ েস্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকা পরিচালনা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অক্ষম যেহেতু বর্তমানে এ বিষয়গুলো আন্ড়র্জাতিক পুঁজির চলাচল এবং বিনিয়োগ ধারা নির্ধারিত হচ্ছে। এ প্রবন্ধে বিশ্বায়নের সংজ্ঞায়নে উপরোক্ত মতামতটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এভাবে বিশ্বায়ন হলো একটি ব্যাপক এবং বহুমুখী প্রপঞ্চ যা বিবিধ কার্যক্ষেত্র যেমন রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিভ্রমণীয় এবং পরিবেশগত মিথস্ক্রিয়ার সন্নিবেশ। যাহোক বিশ্বায়নের ধারণা বিযুক্ত এবং যুগপৎভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। যদিও চূড়ান্ড়ভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বহুজাতিক আর্থিক শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ করপোরেশনের দ্বারা ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং বহুল আলোচিত বিশ্বায়ন মূলত অর্থনৈতিক জীবনের বিশ্বায়নকে বোঝায় যা আদর্শ পুঁজিবাদ রূপে দেখা যায় এবং বাজার সম্প্রসারণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন (যদিও বিষয়টি কেবলমাত্র অর্থনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) বলতে মূলত বাণিজ্য, উৎপাদন ও পুঁজির গতিশীলতার প্রেক্ষিতে আন্ড়ঃরাষ্ট্রীয় সীমারেখার অবলুপ্তিকে বোঝানো হয় বা সহজ অর্থে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আন্ড়ঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহের মাত্রাকে অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের একটি গুর"ত্বপূর্ণ নির্দেশক বা পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের দুটি গুর"ত্বপূর্ণ দিক লক্ষ করা যায়— উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশ্বায়ন (যা বাণিজ্য উৎপাদন ও প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত) এবং লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়ন। এ ব্যবস্থায় আদর্শিক ভিত্তি নয়া-উদারনৈতিকবাদ (Neo-liberalism) ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এটি একটি অর্থনৈতিক মতবাদ যার মূল কথাগুলো হলো রাজস্ব ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, বি-নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণ। নয়া-উদারনৈতিকবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্বায়নকে যেভাবে চিত্রিত করা হয় বাস্ড়বে কিন্তু ব্যাপারটা তত সহজ নয়। উপরন্তু বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের জটিল ও সক্রিয় সম্পর্কই বিশ্বায়নের আকার ও পরিধি নির্ধারণ করে থাকে। বিশ্বায়ন আন্ড়র্জাতিক এলিটগোষ্ঠী, বহুজাতিক করপোরেশন ও পুঁজিব্যবস্থাপকদের সামনে এক বিরাট সুযোগ ও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় বাধা ধীরে ধীরে উঠে যেতে শুর" করায় অবাধ বৈশ্বিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সহজ কথায় অর্থনৈতিক বিশ্বায়নে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা— মূলধনের অত্যন্ড় দ্র"ত চলাচল, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের উলেণ্টখযোগ্য বৃদ্ধি এবং বহুজাতিক সংস্থার আধিপত্য।

নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়, এর একটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে। এর অর্থনৈতিক ভিত্তিটি হলো পণ্য ও পুঁজির অবাধ প্রবাহ, আর রাজনৈতিক লক্ষ্য হলো বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও আইনি-প্রক্রিয়ার বৈশ্বিকরণ। বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের আইনগত, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর উপস্থিতি বৈশ্বিক বাজার-অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে। সে কারণেই বহুজাতিক পুঁজির কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বিভিন্ন দেশের জন্য একই ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বা Structural Adjustment Programme (SAP) বাস্ড়বায়ন করেছে । মূলত এ সমন্বয় কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল : প্রথম পর্যায়ে অর্থনীতির

উদারীকরণ (বাজার মূল্য ঠিক করা বা getting prices right); এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্র ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্বিন্যস্ড় করা (প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করা বা getting institutions right) যাতে বাজার অর্থনীতি যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। এবং অধিকাংশ দেশেই এ কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে গরিব ও শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান নিম্নমুখী হয়েছে এবং চরম দারিদ্র্য, রাজনৈতিক সংঘাত, অস্থিরতা এবং অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ।

এভাবে গত দশক কিংবা তারও বেশি সময় জুড়ে জাতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, আধিরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব, জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস, উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার জোয়ার এবং বিশ্বজুড়ে ভোক্তা সংস্কৃতির গঠন বিভিন্নভাবে পুরো বিশ্বকে অনেকটা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে।এবং দাবি করা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রভাব প্রশ্নাতীতভাবে জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করেছে কিংবা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমিত করেছে।

১৯৯৫ সালে গেণ্ঢাবাল গভর্নেন্স কমিশনের রিপোর্টে একটি প্রশ্ন তোলা হয় "Global Actor" (বৈশ্বিক চালক) কারা? এর উত্তরে মোটা দাগে দু'ধরনের প্রাথমিক Global Actor চিহ্নিত করা হয়: একদিকে রয়েছে জাতি রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে বৈশ্বিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাজার। এছাড়া আরও দু-ধরনের Global Actor আলাদা করা যায়। যেমন- আন্ড়র্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং এনজিওসমূহের নেটওয়ার্ক। আন্ড়র্জাতিক সংগঠনসমূহ জাতিসংঘের পতাকাতলে কিংবা বিশ্বশান্ড়ি শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবার বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রের মতামত, পছন্দ বা আপসমূলক অবস্থানকেই নির্দেশ করে। তারপরেও বিশ্বায়নের কারণে রাষ্ট্রসমূহের দুর্বল হওয়ার মানে এ নয় যে, সকল জাতীয় সরকার নিজেদেরকে পুরোপুরি ক্ষমতাহীন ভাবতে পারে। হান্টিংটনের (1991) পর্যবেক্ষণ অনুসারে- "রাষ্ট্রসমূহ আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বময় সত্ত্বা হিসেবে আছে এবং থাকবে।" তারা সেনাবাহিনী পোষে, কূটনীতি পরিচালনা করে, চুক্তি সম্পাদন করে, যুদ্ধ করে, আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রভাব বিস্ড়ার করে এবং উলেণ্ঢখযোগ্যমাত্রায় উৎপাদন এবং বাণিজ্য নির্ধারণ করে।"

কিন্তু হান্টিংটন সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন "যদিও রাষ্ট্র বিশ্বব্যবস্থায় প্রাথমিক চালক হিসেবে রয়ে গেছে, তথাপি তার সার্বভৌমত্ব, কার্যাবলি ও ক্ষমতার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আন্ড়র্জাতিক সংস্থাগুলো ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করছে এবং রাষ্ট্রের নিজের সীমানায় যা ইচ্ছে তাই করা থেকে বিরত রাখছে। বৈশ্বিকভাবে রাষ্ট্রের সরকারগুলো প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সত্তার নিকট বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা হারানোর একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারগুলো উলেণ্ঢখযোগ্যভাবে দেশের ভেতরে এবং বাইরে অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়েছে। এবং চিন্ড়া, প্রযুক্তি পণ্য ও মানুষের প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু উভয়সঙ্কট যাই হোক না কেন বিশ্বব্যাংকের নিকট রাষ্ট্রই হচ্ছে অর্থনীতির বিশ্বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি, যা সমৃদ্ধি আনতে পারে।"

বস্তুত যদি রাষ্ট্রের স্বীকৃত কার্যাবলি আলোচনা করা হয় তবে দেখা যায়, উন্নয়নের একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ রাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের কার্যাবলি এবং কার্যকরি ভূমিকা কিরূপ হওয়া উচিত তা তত্ত্বীয় এবং বাস্ড়বতার নিরিখে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা হবে।

৩। রাষ্ট্রের কার্যাবলি ও ভূমিকা : তত্ত্বীয় ধারণা এবং বাস্ড়বতা

আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোচনার একক হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র একটি মানবিক সংগঠন। সামাজিক প্রয়োজন এবং চুক্তির মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সামাজিক সম্পদসমূহের সুষ্ঠু বণ্টন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্র কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং 'রাষ্ট্র' হলো একটি সার্বভৌম সংঘ' (Sovereign Association)। আধুনিক বিশ্বায়ন ভাবনার অতি প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অবস্থান কোথায়, রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করে অথবা করা উচিত, উন্মুক্ত বাণিজ্যনীতিতে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের পরিসীমা থাকবে কি থাকবে না কিংবা কতটুকু সীমিত করা যায় । এ প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে শুরুতেই এ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কি তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক তত্ত্ব বা বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক তত্ত্ব (Liberal Democratic Theory or Pluralist Liberal Theory)

(২) মার্কসবাদী তত্ত্ব (Marxist Theory)

৩.১। উদারপন্থী বা বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক তত্ত্ব : (Liberal Democratic Theory or Pluralist Liberal Theory)

এ দৃষ্টিভঙ্গি দুটি দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত– (১) উদারতাবাদ এবং (২) গণতন্ত্র।

উদারতাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, আইনি সাম্য প্রভৃতি চেতনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে গণতন্ত্র বহুত্ববাদ, দলীয় রাজনীতি, নির্বাচন, সংসদ প্রভৃতি প্রত্যয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। উদারতাবাদ অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার, স্টুয়ার্টমিল, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখের চিন্তা-চেতনার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে। এ মতবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাদাতা, বাজার অর্থনীতির গুরু এডাম স্মিথের বিশেণ্ডষণ উদারতাবাদকে সর্বোতভাবে শক্তি যোগায়। স্মিথ উৎপাদন বণ্টন তথা বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একেবারে সীমিত করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। স্মিথের মতোই স্পেন্সার মনে করেন "সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যক্তির মেধা-মনন-সৃজনশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।" গণতন্ত্রের ধারণা লক, রুশো ও ভলতেয়ার প্রমুখ চিন্তাবিদদের চেতনার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়। তাঁরা মনে করেন, সমাজে বহু ব্যক্তি, বহু গোষ্ঠীর বহুমুখী স্বার্থ পরস্পর বিপরীতমুখী হতে পারে কিন্তু তার চূড়ান্ত সমাধান হবে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নয় বরং পারস্পরিক সমঝোতা এবং দর কষাকষির মাধ্যমে। আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (রাজনৈতিক দল, সংসদ, নির্বাচন) উন্নয়নের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম হয় তাই সমাজের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আর শিল্পায়ন সমাজের এ বহুত্ববাদী কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

সমাজবিজ্ঞানী Nordinger-এর মতে, এ তত্ত্বের আলোকে রাজনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে খুবই সামান্য স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত

হয়েছে কিন্তু খুবই সামান্য ভূমিকা পালনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থায় সকল জননীতি সমাজের পছন্দমতো এবং ইচ্ছানুযায়ী গৃহীত হবে এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে (অক্রিয় বা পরোক্ষ) এ নীতিগুলো বিনা বাধায় মেনে নেয়া। এ মতবাদের একজন শীর্ষস্থানীয় প—িত Almond ষাটের দশকে সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় উন্নয়নের ধারণার অবতারণা করেন এবং রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুর—ত্বহীন বলে প্রতিপন্ন করেন। তাঁরা মনে করেন, "উন্নয়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে অথবা উন্নয়নের ফলাফল সম্প্রসারিত করতে রাষ্ট্রের তেমন কিছু করার নেই। উন্নয়ন আসলে আধুনিকায়ন, শিল্পায়নের সমার্থক, এটা স্বাভাবিক বিকাশের ফলশ্র—তি হিসেবে এমনিতেই আসবে"।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে যখন ধ্র—পদি অর্থনীতিবিদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের জয় জয়কার ছিল তখন রাষ্ট্রকে দেখা হতো নিয়ন্ত্রণমূলক ও সর্বাত্মকবাদী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে। আর সে জন্যই তারা ব্যক্তি উদ্যোগ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীতে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেন, এর মধ্যে সেইন্ট সাইমন, এডাম স্মিথ, স্পেন্সার, ভলতেয়ার প্রমুখের নাম উলেণ্যখযোগ্য। স্মিথ মনে করেন, মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর। নিজের স্বার্থেই সে উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখে। ফলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ উৎপাদনের স্বাভাবিকগতিকে ব্যাহত করে মাত্র। উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল থাকে ভোক্তা স্বার্থ সংশিণ্টষ্টতাকে কেন্দ্র করে। আর এ স্বার্থের পেছনে, তাদের মতে, ভারসাম্য বিধান করে সমাজের অদৃশ্য হাত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত ভূমিকা পালনের বিরোধী ছিলেন। তাদের মতে-

- রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কল্যাণমূক কার্যক্রম জনগণ এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে আলস্য তৈরি করে যা পরিণামে উৎপাদনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।
- এতে করে সরকার এবং রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ফলে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পায়।
- রাষ্ট্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মিতকরণ কখনোই উৎপাদন, উন্নয়ন বা ব্যবসা-বাণিজ্য নয়।
- স্বভাবতই মানুষ রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিক আশা করে কিন্তু কর দিতে চায় না। রাষ্ট্র অতিরিক্ত উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে কর বৃদ্ধি পেলে জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু অধিক কল্যাণমূক কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্র আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রকারান্তরে উন্নয়ন প্রক্রিয়া আবার পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে।

মার্কসীয় সমাজচিন্তা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এ চিন্তা-চেতনা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু বিগত শতাব্দির আশির দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা এবং বিশ্বায়ন ধারণার প্রচার, বহুজাতিক কোম্পানির চাপ এবং আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালী ভূমিকার কারণে বর্তমান বিশ্বে উপরোক্ত চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

৩.২। মার্কসবাদী তত্ত্ব (Marxist Theory)

ঊনবিংশ শতাব্দিতে প্রধানত মার্কসীয় চিন্তাবিদরা পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলে সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকার ওপর সর্বাধিক গুর—ত্বারোপ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কস দ্বন্দ্বমূলক মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষমতার ধরন ও বণ্টনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি বলেন, উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরাই ক্ষমতার অধিকারী।

তাঁরাই যেহেতু মালিক হিসেবে উৎপাদন যন্ত্র তথা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু তারাই তাদের ক্ষমতা রক্ষা করে এবং স্বীয় শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। প্রচলিত রাষ্ট্র বুর্জোয়াদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এ শোষণের কাঠামো ভেঙে ফেলতে মার্কস কমিউনিজমের ডাক দিয়েছেন। এবং কমিউ্যন কাঠামোয় অর্থনীতিতে কিংবা বাজার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর আরোপ করেছেন।

পরবর্তীকালে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমাজের ব্যাপক কল্যাণ এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে মুক্তবাজারের ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে কল্যাণ চিন্ড়াবিদ এবং নব্য-মার্কসবাদীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

তাঁদের মতে, "উন্নয়নের মতো সার্বিক একটি বিষয় বাজার ব্যবস্থা তথা কিছুসংখ্যক অর্থগৃধিনু ব্যক্তির খেয়াল খুশির ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না।" মার্কসবাদীদের প্রধান প্রধান বক্তব্য নিম্নরূপ:

- সমাজের সার্বিক কল্যাণ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সম্পদ, শ্রমশক্তি এবং সামাজিক বাস্ড়বতার ওপর নির্ভরশীল যা কখনোই রাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়।
- সমাজে যে সকল কাঠামোগত দারিদ্র্যের উপাদান বিদ্যমান থাকে তা রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া অপসারণ সম্ভব নয়। শিশু, পতিত, অসহায় শ্রেণির কল্যাণ কখনোই বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব নয়। এখানে একমাত্র রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো বিষয়গুলো যেখানে দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং কর্মসূচির প্রশ্ন রয়েছে সেগুলো কখনোই মুনাফা লোভী শ্রেণির হাতে ন্যস্ড় করা যায় না।
- প্রায় সময়ই ব্যবসায়িক উৎপাদক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ-জনস্বার্থের ওপর চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। যেমন-মার্কিন পরিচালিত ইরাক/উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল তেল কোম্পানি এবং অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। যদিও যুদ্ধের ব্যয় বহন করা হয় জনগণের করের টাকায়।
- মানবাধিকার, অসাম্য, আয় বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলোতে রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যুক্তিযুক্ত যে, মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য তথা উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বাত্মকবাদী নয়, তবে শক্তিশালী হওয়া উচিত। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ G. Myrdal তাঁর বিখ্যাত *Asian Drama* গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমিকার ওপর বিশেষভাবে গুর"ত্ব দিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকবে কি থাকবে না তা কোনো বিতর্কের বিষয় হতে পারে না বরং রাষ্ট্রীয় ভূমিকা কি হবে এবং তা কত দূর সম্প্রসারিত হতে পারবে তা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে।

বিশেণ্ডষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। যথা- (১) নিয়ন্ত্রণমূলক এবং (২) কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব বা ভূমিকাগুলো নিম্নরূপ:

- জননিরাপত্তা এবং ভৌগোলিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা
- নাগরিকদের আইনগত এবং মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দুষ্টলোকের শাস্তিবিধান কার্যকর করা
- জনকল্যাণের নিশ্চয়তা (Ensure Public welfare)
- জনসম্পর্কিত বিষয়াবলি পরিচালনা করা (Manage Public affairs)
- জনগণের বিপরীতমুখী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় করা।

Maciver রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ভূমিকার কথা বলেছেন তা হলো দেশের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ করা।

৪। বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্র : রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

বিশ্বায়ন কিভাবে রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে? এ নিবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব এবং প্রক্রিয়া নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। একদিকে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, "জাতি রাষ্ট্রের" ধারণা এখন একটি ভবিষ্যতহীন এবং সেকেলে বিষয়।" যেমন- Opello এবং Rosow (1999: 225) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "বর্তমান অবস্থা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিদ্যমান ধরনকেই চ্যালেঞ্জ করছে না বরং রাষ্ট্রীয় সীমানা অক্ষুণ্ন রাখার সম্ভাবনা, সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।" অন্যদিকে বাকিরা মনে করেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কর্তৃত্বের সবিরাম এবং অনিয়মিত প্রভাব সত্ত্বেও রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে তার সক্রিয় অবস্থানেই আছে।

কেনিচি ওহমের (২০০০) ভাষায় "রাষ্ট্রের অধীনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার দিন শেষ হয়ে গেছে। জাতি-রাষ্ট্র এখন অতি দ্রুততার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত সত্তা হারাচ্ছে। হয়ে উঠছে অকার্যকর... রাষ্ট্র এখন এক মৃত্যুপথযাত্রী 'ডাইনোসর'। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি যুক্তি দেখান, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থেই এক বিশ্ব অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানি ও পুঁজিবাজার এ বৈশ্বিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাজনৈতিক সীমা-পরিসীমার ধারণা ও অস্তিত্ব আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এমনকি এটাও দাবি করা হচ্ছে- জাতীয় পর্যায়ে নীতি গ্রহণের বিষয়টি এখন সেকেলে ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে; কেননা জাতীয় অর্থনীতি এখন বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। যাহোক বিশ্বায়নের ফলে জাতি রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়া এবং সামর্থ্যের সঙ্কটের প্রকৃতি এবং মাত্রা খতিয়ে দেখাই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, বহুজাতিক পুঁজির দাপটে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক ও পুন:বণ্টনমূলক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন অনেকটাই কঠিন হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু অতি-বিশ্বায়নবাদী[১] এবং অতি উৎসাহী ধারণা রয়েছে যেগুলোর যৌক্তিক ভিত্তি নেই। যেমন- বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মুছে যাবে, কিংবা বিশ্বায়ন রাষ্ট্রবিনাসী এ ধারণার কোনো প্রমাণ আদৌ মেলেনি।

[১] অতি বিশ্বায়নবাদী এদের মতে, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। যার ফলে North and South ব্যবধান কমে যাবে এবং তৃতীয় বিশ্ব ধারণার সমাপ্তি ঘটবে। Ultra Globalists'রা যুক্তি প্রদান করেন যে, পুঁজিবাদের বিস্তৃতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির সংহতি ব্যাপকভিত্তিক সুফল এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। অতি উৎসাহীরা বলেন যে, বিশ্বায়ন জীবন মান উন্নয়নের সম্ভাবনা তুলে ধরেছে, নতুন প্রযুক্তি বিকাশের ফলে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সমস্যা দূরীকরণ এবং শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে।

তদ্রূপ অতি বিশ্বায়নবাদীদের দাবির বিপরীতে এটাই সত্য যে রাজনৈতিক সীমান্ড় এখনো যথেষ্ট গুর"ত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের দু একটি অঞ্চল থেকেই মাত্র রাষ্ট্রীয় সীমান্ড় উঠে গেছে (যেমন- ইউরোপীয় ইউনিয়ন)। রাষ্ট্রীয় ভূখ" নিয়ন্ত্রণ তথা সার্বভৌমত্ব এখনো তাবৎ বিশ্বে অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ এবং আপসহীন ইস্যু হিসেবে বিবেচিত। তবে এটা সত্য, বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা এবং ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের চরিত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৪.১। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং কর্তৃত্বের সঙ্কট

আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বগত এবং প্রায়োগিক উভয় দিক থেকেই সার্বভৌমত্ব সর্বোচ্চ গুর"ত্ববহ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা বলতে অবিভাজ্য, নিরঙ্কুশ এমন এক ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা রাষ্ট্র অভ্যন্ড়রীণ সিদ্ধান্ড় গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে, রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহি:রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ এবং প্রভাব থেকে রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় চূড়ান্ড় ক্ষমতা অর্জন করে। সনাতন ধারণা অনুযায়ী আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কের মূল একক হচ্ছে রাষ্ট্র। এটি জাতীয় অর্থনীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তত্ত্বাবধান করে। আন্ড়র্জাতিক অর্থনীতি অনুযায়ী বাণিজ্য সম্পর্কগুলো হয় জাতিভিত্তিক, বিশেষায়িত এবং শ্রম বিভাজন নির্ভর। সে অনুযায়ী ব্যবসায়ীক গুর"ত্ব প্রতিস্থাপিত হয় জাতিসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক বিনিয়োগের দ্বারা। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কসমূহ হচ্ছে বিলিয়ার্ড বল টাইপের। আন্ড়র্জাতিক ঘটনাসমূহ সরাসরি অভ্যন্ড়রীণ অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করে না এবং আন্ড়র্জাতিক মিথস্ক্রিয়াসমূহ জাতীয় অর্থনীতির জন্য বাধা কিংবা সুযোগ হিসেবে কাজ করে। এবং শ্রমিকদের ক্ষমতা এ পর্যায়ে তুলনামূলক শক্তিশালী। কিন্তু বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে স্বতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতিসমূহ আন্ড়র্জাতিক প্রক্রিয়াসমূহ এবং লেনদেনের দ্বারা পুন:পুন যুক্ত। Global Economy একটি নতুন শক্তি হিসেবে উদ্ভব ঘটেছে। বাজার এবং উৎপাদন পরিণত হয়েছে বিশ্বব্যাপী পণ্যে। জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ধারা আন্ড়র্জাতিক পক্ষসমূহকে নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিহত করা কঠিন। এ পর্যায়ে জাতিভিত্তিক সংস্থাগুলো বহুজাতিক এবং অধিজাতিক করপোরেশনে রূপান্ড়রিত হয়েছে। শ্রমিকদের ক্ষমতা হয়েছে দুর্বল। কারণ বহুজাতিক সংস্থাগুলো শ্রমের মজুরি যেখানে কম পায় সেখানে অবস্থান নেয়।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত বেশকিছু প্রভাবশালী উত্তরোত্তর, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাংশ্রয়িকভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে জাতীয় নীতিনির্ধারকদের স্বাধীনভাবে এবং কার্যকরিভাবে ভূমিকা পালনের সামর্থ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিশ্বায়নের অন্যতম একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে- "বিস্ড়ৃত আন্ড়ঃসরকারীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তার (Actors) প্রাধান্য বৃদ্ধি যেগুলো একটি আন্ড়র্জাতিক ব্যবস্থা পরিচালনার প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হয়েছে; যা সাধারণভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সংগঠিত করা সম্পূর্ণভাবে সামর্থ্যের বাইরে। কেননা জাতীয় সীমানার বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকা" সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সরবরাহ করা ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক আন্ড়র্জাতিক ব্যবস্থার এ অগ্রগতির স্পষ্টভাবেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে গুর"ত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

বেসরকারি তথা ব্যক্তি মালিকানাধীন সংগঠনের বাজারকেন্দ্রিক কার্যাবলীর সর্বব্যাপিতা এবং বাজারের বিকাশ সরকারি খাতকে নানাভাবে উৎখাত করেছে। রাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণকে ত্বরান্বিত করছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহ বর্তমানে সে সকল কার্যকর ভূমিকা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যা পূর্বে জাতীয় সরকারসমূহ সম্পাদন করতো। এর ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রও সমভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

কতিপয় রাষ্ট্র এ প্রক্রিয়ায় অন্যদের তুলনায় খুব বেশি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে যা (নীতিগতভাবে সমান) সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে "অসমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে" মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এমনকি Susan Strange (1996:14)-এর মতে, এভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস ব্যাপকভাবে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যায়। কেননা জাতীয় সরকার থেকে কর্তৃত্ব চলে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ায় সামগ্রিকভাবে অকর্তৃত্বের একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে অশাসন বা দু:শাসন বলা যেতে পারে।

আন্ড়র্জাতিক সম্পর্কে কর্তৃত্ব কেন্দ্রিক আলোচনায় Cutler এবং তার সহযোগিরা (১৯৯৯) ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের ফলপ্রসূতার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তিগত খাতের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের পারদর্শিতা দাবি করে নির্দিষ্ট ইস্যুগুলোতে সরকারের দায়িত্বসমূহ কেড়ে নিচ্ছে। কিংবা সরকার অর্থনৈতিক মতাদর্শ, বিশ্বায়ন কিংবা রাষ্ট্রের অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে সে দায়িত্বসমূহ পরিত্যাগ করছে। অনলাইন বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, মেধাস্বস্ড় ইস্যু, কিংবা সরকারি নীতিসমূহের প্রভাব এবং কার্যকরিতা নির্ধারণের জন্য রেটিংস সংস্থাসমূহ যাই হোক না কেন ক্রমাগতভাবে অনেকগুলো বিষয়ে বা খাতে সরকারকে ব্যক্তিগত খাতের (অনির্বাচিত কার্যকর্তাদের সঙ্গে) কর্তৃত্ব ভাগাভাগি বা ছেড়ে দিতে বলা হয় কিংবা বাধ্য করা হয়।

যাহোক সার্বভৌমত্বের বদলে কর্তৃত্ব অ্যাপ্রোচ বেছে নেয়ার অন্যতম সুবিধা হচ্ছে, রাষ্ট্রের হাতে সকল কার্যক্ষমতা থাকে এরকম একটি পূর্ব ধারণা ধারণ করার বদলে এটি আমাদেরকে সে সকল কার্যকর্তা কিংবা প্রতিষ্ঠানকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে যাদের হাতে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ড় দায়িত্ব রয়েছে। থমসন (1995)-এ প্রেক্ষিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'কর্তৃত্বের মৌলিক ধারণা হচ্ছে- "আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগ।" এটা সত্য যে, কিছু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ড় ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হলো এ ধরনের সিদ্ধান্ড়ের সংখ্যা খুব কম এবং এটা সচরাচর ঘটে না। কেননা এমন একটি পরিবেশ বিরাজ করছে যেখানে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ শুধু বৈধ এবং সাদরে গৃহীতই নয় তদুপরি জাতীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়সমূহ এবং দায়িত্বের মূলভিত্তি "জাতীয়ভাবে নির্ধারিত ভূখন্ডের" সঙ্গে মূলগতভাবে আজ তার বাঁধা নয় সেখানে প্রায়োগিকভাবে কিংবা তত্ত্বীয়গতভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে আছে এটা মনে করার আর কোনো ভিত্তি নেই।"

নিশ্চিতভাবে এটা বিবেচনা করা সহজ, এ পরিবর্তিত অবস্থা এবং ক্ষমতার নতুন কাঠামোগত বিন্যাস একটি বিস্ড়ীর্ণ প্রক্রিয়ার অংশ যেখানে কর্তৃত্ব শুধুমাত্র একচেটিয়া রাষ্ট্রের কাছেই আছে বা অপরিহার্যত সার্বভৌমত্বের বিষয় সম্পত্তি না হয়ে বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় এবং বিরাষ্ট্রীয় কার্যকর্তাদের মধ্যে পুন:বণ্টিত হচ্ছে। কিন্তু সার্বভৌমত্ব এমন একটি অবিভাজ্য প্রত্যয় যে এটা শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ইস্যু এবং ক্ষেত্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কর্তৃত্ব অর্জন করার সামর্থ্যকে বোঝায় না বরং সমগ্র সত্তার ওপর পূর্ণাঙ্গভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের সামর্থ্যকে বোঝায়। সুতরাং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

Reinicke (1998:7) 'অভ্যন্ড়রীণ এবং 'বহি:স্থ' সার্বভৌমত্বের অবস্থানকে তুলে ধরে এ সমস্যাটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিশ্বায়ন যদিও বহি:স্থ সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আপস করেছে, কিন্তু দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোগত পুন:বিন্যাস এবং কর্পোরেট

সংস্থা এবং আর্থিক ক্ষমতার নতুন নেটওয়ার্ক অভ্যন্ড়রীণ সার্বভৌমত্বের প্রয়োগে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করছে।

৪.২। বিশ্বায়ন এবং পরিবর্তনশীল শাসন প্রক্রিয়া

বিশ্বায়নের ফলে শাসন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন বর্তমানে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। শাসন বলতে আমরা সে সকল প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়ই) বুঝি যারা একটি গ্র"পের সম্মিলিত কর্মকা" পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার হচ্ছে একটি অভিন্ন সত্তা যা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং নিয়মানুগ বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। বিশ্বায়নের যুগে শাসন প্রক্রিয়া অপরিহার্যভাবে কেবলমাত্র সরকার এবং আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহ দ্বারাই পরিচালিত হয় না। ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সমিতি বা ফেডারেশন, এনজিওসমূহ এবং এনজিওসমূহের সমিতি সকলেই শাসন প্রক্রিয়া এবং শাসন প্রতিষ্ঠা করতে জড়িত থাকে। এমনকি সরকারের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একত্রিতভাবে আবার সরকারের কর্তৃত্বের বাইরে থেকেও (Keohane & Nye 2000) ।

সনাতন অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিপরীতে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোকে শাসন ধারণায় নতুন বিকল্প খোঁজার তাগিদ দিচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে কাঠামোগত সংস্কারের পরবর্তী সময়ে নাগরিক সংগঠনসমূহ ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করেছে। এটা উলেণ্ঢখযোগ্য যে, সংস্কার পরবর্তী সময়ে জনজীবনের দৈনন্দিন ইস্যুগুলো থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেওয়ায় অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শূন্যতা সিভিল সোসাইটির বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে সিভিল সোসাইটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের শূন্যকৃত স্থান দখল করেছে তা নয় বরং যেখানে রাষ্ট্র ও বেসরকারি খাত কাজ করছে সব ক্ষেত্রেই বিচরণ করছে।

বৈশ্বিক রাষ্ট্রের সরকারগুলো প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় সত্তার নিকট বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা হারানোর একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। নতুন উন্নয়ন প্যারাডাইমে দারিদ্র্য-দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য 'গণতান্ত্রিক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে গুর"ত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হচ্ছে। আন্ড়র্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর মধ্যেও (যেমন- USAID, UNDP) বিশ্বব্যাপী স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ড় বিষয়ের প্রতি ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। স্থানীয় সরকারের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের বা রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ কমানোর কথাও বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে।

বাস্ড়বে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে 'বিকেন্দ্রিকরণ' ধারণাটি তেমন কোনো গুর"ত্ব বহন করে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় নেয় গুটিকতক টেকনোক্রেট আর রাজনৈতিক এলিট। জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো বিতর্ক বা আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে না। এছাড়া বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় স্ব-শাসনের নামে গুর"ত্বপূর্ণ উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকা" রাষ্ট্রের বদলে এনজিও ও স্থানীয় সংগঠনসমূহের ওপর ন্যস্ড় করা হচ্ছে। দায়িত্ব দেওয়ার আগে ভেবেও দেখা হচ্ছে না আদৌ তাদের ওই সব কাজ করার সামর্থ্য আছে কিনা। উদারনৈতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একদিকে উপর থেকে রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে নিচের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিকেন্দ্রিকরণ, এনজিও, দাতব্য, সেল্ফ হেল্প গ্র"প, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ইত্যাদির ছদ্মবেশে। এতে রাষ্ট্রের কল্যাণধর্মী কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৪.৩। স্বাধীন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস

বিশ্বায়নের দুটি গুর"ত্বপূর্ণ স্ড়ম্ভ হলো আর্থিক ও পুঁজিখাতের উদারীকরণ। আর্থিক বিশ্বায়নের ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় (যেমন মুদ্রানীতি) গ্রহণ ও বাস্ড়বায়নের হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আন্ড়:রাষ্ট্রীয় পুঁজির প্রবাহ জাতীয় পর্যায়ে মুদ্রা সরবরাহ, বৈদেশিক বিনিময় হার ও সুদের হার নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ড় ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া আন্ড়র্জাতিক আর্থিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে রাজস্ব প্রতিবন্ধকতা ও 'শৃঙ্খলা' আরোপ করার কারণে দরিদ্র অভিমুখী ও পুন:বণ্টনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টিও সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা এখন এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, যেসব দেশ প্রগতিশীল বা উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছে সেসব দেশের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড়ও তারা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

তবে মুক্তবাজার ব্যবস্থা কায়েম হলেও সরকারের পক্ষ থেকে বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়নি এবং এটা লক্ষণীয় বেশিরভাগ দেশেই সরকারি ব্যয় কমার বদলে দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাসের বিপরীতে বরং কোনো কোনো বিশেণ্ডষক যেমন ড্যানি রডরিক (D. Rodrik 1997) বলেছেন, "বাজার যত বেশি মুক্ত হবে সরকারি হস্ড়ক্ষেপের মাত্রা তত বেশি বাড়তে থাকবে। কেননা বিশ্বায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের ঘাড়েই বর্তায়"।

তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, শেয়ার মার্কেট বা পুঁজিবাজার যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিময় ঘটছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমারেখার ধারণা গুর"ত্বহীন বিবেচিত হচ্ছে। সন্দেহ নেই বিশ্বায়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের কনজিউমার কালচারের অবাধ প্রচার এবং প্রসার। যাহোক বিশ্বায়নের যুগে এ ধারণাও গড়ে উঠেছে যে সরকারের পক্ষে সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় কেননা বহুবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেমন : ইন্টারনেট বিপণ্ডব ও তথ্য আদান প্রদানের অবাধ স্বাধীনতা, ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি'র কনজিউমার কালচারের অবাধ প্রচার এবং প্রসার। ফলশ্র"তিতে সরকারি সেবাসমূহের সঙ্কোচন, বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিদ্যমান কর্মসূচিকে পরিচালনার জন্য আধা-স্বায়ত্তশাসিত কার্যনির্বাহী সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হস্ড় ান্ড়র সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণের পরিসর হ্রাস করেছে।

আবার অনেকে বলেন, রাষ্ট্রীয় খাতের বেসরকারিকরণের অর্থ এটা নয় যে, বেসরকারিকরণের ফলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপ কমে গেল। বেসরকারিকরণের ফলে হয়তো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে। তবে অন্যদিক দিয়ে আবার রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্র নানা ধরনের বিধিবিধান প্রণয়নের মধ্যদিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বাজারে প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুন কেমন হবে, কখন কি কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া যাবে ইত্যাদি নানা ধরনের নীতিমালা প্রণয়নের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিষয়ের ওপর হার্ভে ফেইনবাম (Harvey Feignbaum) ও তার সহকর্মীদের লেখা (১৯৯৯) "Shrinking the State" নামক বইটি বিশেষভাবে গুর"ত্বপূর্ণ। ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারের আমলে ব্যাপক আকারে যে বেসরকারিকরণ ঘটেছে তার ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণ রয়েছে এ বইতে। তাঁদের মতে,

থ্যাচার সরকারের আমলে ব্যাপকাকারে বেসরকাকিরণ ঘটেছে যার ফলে সরকারকে অনেকগুলো সেবা (যেমন টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি) সরবরাহ কার্যক্রম থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে অর্থনীতিতে সরকারের নিয়ন্ত্রণধর্মী ক্ষমতার মাত্রাও যথেষ্টভাবে বেড়ে গেছে। বর্তমানে ডেভিড ক্যামেরুনের কনজারভেটিভ সরকারও একই নীতি অনুসরণ করেছে। বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নের মধ্যদিয়ে সরকার এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে যে, বেসরকারিকৃত সেবা প্রদান ব্যবস্থা যেন কোনোভাবেই ভোক্তার স্বার্থকে ক্ষুণ্ন না করে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা কোনোভাবেই কমেনি।

তবে বেশিরভাগ দেশেই সরকার বেসরকারিকরণের স্রোতকে বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক মুনাফা করার মনোবৃত্তিতে ভোক্তা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং পণ্য ও সেবার দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৪। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস : রাষ্ট্রভেদে বিভিন্নতা

আন্ড়র্জাতিক পুঁজির দাপট সত্ত্বেও রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন হয়ে যায়নি। অন্ড়ত বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা-চর্চার পার্থক্যের দিকে তাকালে এটা বোঝা যায়। হ্যাঁ-জুন চ্যাং দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রভেদে আন্ড়র্জাতিক পুঁজির প্রভাব ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুভূত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে এ প্রভাবের মাত্রাও হয় ভিন্ন ভিন্ন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই প্রভাবের মাত্রা নির্ভর করে দেশটির আয়তন, সামরিক শক্তি ও সক্ষমতার উপর। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সাধারণত দুর্বল ও ক্ষুদ্র দেশগুলোর দর কষাকষির ক্ষমতা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। তাদের পক্ষে জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আধুনিক ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহ এখন আরও বেশি শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন ও অক্ষত রেখে এ দেশগুলো এখন আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা গ্রহণে অনেক বেশি সক্ষম।

- বহুজাতিক পুঁজিই সকল ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে এটা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। যেসব দেশের অভ্যন্ড়রীণ বাজারের আয়তন অনেক বড় তারা আন্ড়র্জাতিক পুঁজির সঙ্গে দর কষাকষির মধ্যদিয়ে ভালো সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। যেমন- চীন ও ভারত। ক্ষুদ্র আয়তনের বাজারসম্বলিত দেশগুলো তা পারে না। যেমন- বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ।

- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকম দেশীয় নীতি-কৌশল অবলম্বন করে থাকে। দেখা গেছে, কোনো কোনো দেশের সরকার তাদের সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-কারখানা বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আবার কোনো কোনো দেশ তাদের নিজস্ব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত হবার জন্য চাপ দিয়েছে যাতে সেগুলো আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। আবার উন্নত দেশগুলো বাজার উন্মুক্তের কথা বলেও তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোকে রক্ষার জন্য নানা ধরনের সংরক্ষণমূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন কোটা আরোপ করেছে।

- রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যয় তথা সামরিক এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর জন্য বাজেট বরাদ্দের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ দেশেই তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধিষ্ণু মিলিটারি বাজেট সামগ্রিক বাজেট ঘাটতির জন্য দায়ী। সুতরাং রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং ব্যয় কমে যাওয়ার বিপরীতমুখী দৃষ্টান্ড় দেখা যাচ্ছে। কল্যাণমুখী কার্যক্রমে রাষ্ট্রের ব্যয় সঙ্কোচন করা হলেও নিরাপত্তা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা লক্ষণীয় যে, বিশ্বায়নের প্রসারক সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা তথা সামরিক বাজেট বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলছে না কিন্তু কল্যাণমুখী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেই তারা হৈ চৈ শুর" করে দেয়।

৫। অর্থনৈতিক উদারীকরণ : বিরাষ্ট্রীকরণ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১-১৯৭৫ পর্যন্ড় উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপের এবং নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করে আসছিল এবং এ সময়ে ব্যাপকহারে উৎপাদনখাত ও বণ্টন ব্যবস্থার জাতীয়করণ, শক্তভাবে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপের বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়; যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্রকে' গ্রহণ করেছিল। এ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় স্বাধীন বাংলাদেশে ইস্ট পাকিস্ড়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (EPIDC) অধীন শিল্পসমূহ, পাকিস্ড়ানি মালিকদের পরিত্যক্ত শিল্পসমূহ এবং বাঙালি মালিকদের পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পসমূহ সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। ১৯৭৫ সালে আগস্টের নির্মম ঘটনার মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তনের পর ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিমালিকাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতখাতে হস্ড়ান্ড়রিত করা হয়। ব্যক্তিগতখাতে পুঁজি বিনিয়োগের সিলিং সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যক্তিখাতে বিদেশি পুঁজিপতিদের সঙ্গে বাঙালি মালিকদের যৌথ বিনিয়োগের বির"দ্ধে সকল প্রতিবন্ধকতা তুলে দেয়া হয়। এসব নতুন নীতিমালার কারণে ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ শিল্পখাতে মালিকানা বিন্যাসের চেহারা ছিল নিম্নরূপ:

ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা : ৬৯.১০ শতাংশ

খ) দেশি-বিদেশি যৌথ ব্যক্তি মালিকানা : ২.৫০ শতাংশ

গ) দেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন : ২৮.৪০ শতাংশ।

১৯৮২ সালে ঘোষিত হয় নয়া শিল্পনীতি (New Industrial Policy- NIP)। এ নীতির অধীনে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে বৃহৎ পাটকল ও বস্ত্রকলগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সাল নাগাদ রাষ্ট্রায়ত্ত বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা মাত্র ১৬০টিতে নেমে আসে। যদিও ১৯৭২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৯২টি। ১৯৭২ সালে যেখানে শিল্পখাতের ৯২ শতাংশ সম্পদ ছিল রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ১৯৮৫ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। ১৯৯৩ সালে সরকার "Privatisation Board" গঠন করে মোট ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যক্তি মালিকানায় হস্ড়ান্ড়রের জন্য দায়িত্ব দেয়।

আশির দশকে সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকার পতন ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে থাকে। যে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ব্যক্তিমালিকানা ও বাজার অর্থনীতি দ্বারা স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তি মালিকানা ও বাজার

অর্থনীতির ব্যর্থতাগুলোর প্রতিষেধক সমাজতন্ত্র নয়, এ প্রতিষেধক হচ্ছে বাজার ও ব্যক্তি মালিকানার ওপর গণতান্ত্রিক সরকারের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।" যাহোক ১৯৯০-এর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়, বিশেষ করে বাণিজ্য উন্মুক্তকরণ নীতি গৃহীত হয়। এ সময় বাণিজ্য বড় ধরনের শুল্ক হ্রাস, যৌক্তিকভাবে ট্যাক্স ও ট্যারিফ নির্ধারণ, বাণিজ্য সংক্রান্ড় (দেশি শিল্পের প্রতি সুবিধা প্রদানকারী) অভ্যন্ড়রীণ সংরক্ষণ নীতি প্রত্যাহার, আমদানির জন্য লাইসেন্সের প্রথা বাতিল এবং নমনীয় বিনিময় হারের নীতি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সকল বাধা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করা হয়। এক কথায় পুরোদমে বাজার অর্থনীতি চালু হয়।

৬। বাজার এবং রাষ্ট্র : আন্ড়ঃসম্পর্ক নাকি দ্বন্দ্ব?

মূলত রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা সামাজিক সুবিধা প্রদান করে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের পুন:বণ্টনের ব্যবস্থা করে থাকে। রাষ্ট্র হচ্ছে স্থানীয়, প্রাদেশিক, জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সরকারি তিনটি গুর"ত্বপূর্ণ বিভাগের (আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ) সমন্বিত রূপ। লেনদেনের ধারণা থেকেই বাজার ধারণার সৃষ্টি। সাধারণত বাজার বলতে একটি স্থানকে বোঝায় যেখানে কেনাবেচা হয়। অর্থনীতির ভাষায় বাজার বলতে কোনো বিশেষ পণ্যের প্রকৃত ও সম্ভাব্য ক্রেতাকে বোঝায়। সহজভাবে বললে বাজার বলতে আমরা বুঝি ক্রেতা ও বিক্রেতার সমন্বিত রূপ। পণ্যর উৎপাদন ও ক্যাটাগরির দিক থেকে বাজারকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- ভোক্তা বাজার ও শিল্প বাজার। যেখানে চূড়ান্ড় ভোগের জন্য যারা পণ্যদ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করেন তাদের সমষ্টিকে ভোক্তা বাজার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যকে কেন্দ্র করে যে বাজার গড়ে উঠে এবং প্রাত্যহিক উপভোগ বা ব্যবহারের জন্য যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় তাদের সামষ্টিক রূপ হলো শিল্প বাজার। এ অনুচ্ছেদে আমাদের আলোচনা ভোক্তা বাজারকে কেন্দ্র করে পরিব্যাপ্ত হবে। বাজার চলার ক্ষেত্রে যথাযথ স্থিতিশীল অবস্থা ও শর্তের দরকার হয়। দরকার হয় বিশ্বস্ড় অর্থ সরবরাহ। রাষ্ট্রই বাজার এবং বাজার ব্যবস্থাকে তৈরি করে। রাষ্ট্রই বাজার পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করে। কিন্তু এ নীতিমালা বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাজার ব্যবস্থা থেকে এ ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। যেমন- আন্ড়র্জাতিক অর্থবাজারের নিয়ন্ত্রণ, পণ্য ও সেবা উৎপাদনে আন্ড়র্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রভাব, কিংবা স্বল্প শ্রম মজুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণকে দেখভাল করার ব্যাপারে জনকর্তৃত্বের (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

কিন্তু বিপরীতে এটা দেখা যায়, অন্যভাবে বললে, রাষ্ট্রই বাজার ব্যবস্থা তৈরিতে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। পণ্যের এবং শ্রমের নতুন বাজার তৈরি বর্তমানে রাষ্ট্রের একটি গুর"ত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে বাজার ধারণায় যে প্রত্যয়টি বেশি বেশি উচ্চারিত হচ্ছে তা হচ্ছে আন্ড়র্জাতিক বাজার। আন্ড়র্জাতিক বাজার একটি দেশের অভ্যন্ড়রীণ বাজারের ওপর অনেক প্রভাব ফেলে। কোনো দেশই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিনিয়ত তাকে অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আন্ড়র্জাতিক বাজারে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি এবং বিপণন যেকোনো দেশের অর্থনীতির হাতিয়ার। প্রতিটি দেশই আন্ড়র্জাতিক বাজার ধরে রাখতে বিপণন প্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত চালিয়ে যায়। গতানুগতিক Diplomacy কে ছাড়িয়ে 'আজকের বিশ্বে' 'Economic Diplomacy' এর প্রতি অধিক গুর"ত্বারোপ করা হচ্ছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে বেসরকারিকরণ, নতুন করপোরেশনগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন, বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধাসমূহ প্রত্যাহার করে একক বাজার তৈরিতে (যেমন : Single European Act 1987 এর মধ্যদিয়ে একক ইউরোপীয় বাজার ব্যবস্থা চালুকরণ, উত্তর আমেরিকা যেমনটি করেছে NAFTA (নাফটা) এর

মধ্যদিয়ে এবং পুরো বিশ্বজুড়ে এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে) রাষ্ট্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে বাজার কর্তৃত্ব বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার রাষ্ট্র বেশিরভাগ শিল্পসমূহের মালিকানা বিক্রয়, নির্দেশমূলক পরিকল্পনা হ্রাসকরণ এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মসূচি ব্যাপকভাবে সঙ্কোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক তদারকির বিষয়গুলোতে সরাসরি অংশগ্রহণ কমিয়ে দিয়েছে। এ প্রবণতা দেখে বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিশেণ্ডষকরা নিজেদেরকে প্রশ্নে জড়িয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে এ বিদ্যমান প্রবণতায় রাষ্ট্র কি তার কার্যকরি ভূমিকা হারিয়ে ফেলছে (বাজার কর্তৃত্ব কি রাষ্ট্রকে নিস্প্রভ করে ফেলেছে; কিংবা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব নয়)?

বাজার নিয়ন্ত্রণ: বাজার দর বলতে সাধারণত চাহিদা ও সরবরাহ রেখার মাধ্যমে মূল্যমান নির্ধারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। ভোক্তা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার জন্য যে মূল্য প্রদান করে সেটি বাজার দর হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বাজার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক শ্রেণি, পাইকারী ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং খুচরা বিক্রয় দাতাদের ইচ্ছামাফিক বাজার দর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এটা সত্য যে, বাজার দর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। বাজারের পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে কিছু স্থানীয় ফ্যাক্টর এবং একই সঙ্গে আন্ড়র্জাতিক ফ্যাক্টরও জড়িত। প্রায় প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে শস্য বন্যা এবং সাইক্লোনে নষ্ট হয়, যা বাজারের পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়। আন্ড়র্জাতিক সংস্থা যথা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চাপে বাংলাদেশ সরকার এখন আর আগের মতো কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান করছে না। এ সংস্থাসমূহ সমবাণিজ্যনীতি সম্পাদনের নামে কৃষিসহ বাণিজ্যে সরকারি ভর্তুকি প্রত্যাহারে অবিরাম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, বিশ্বায়ন সরাসরি জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সামর্থ্যকে হ্রাস করেছে এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ড় ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে মানদ"সমূহের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যেমন কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাস একটি আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের এজেন্ডা। এর ফলে উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে যা একই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে উৎপাদন কমে যায়। অনেক দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক রয়েছেন, যাদের পক্ষে উচ্চদামে সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় করা সম্ভব হয় না, যা মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং বাজারে পণ্য সরবরাহ কমিয়ে দেয়। সুতরাং পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের আন্ড়র্জাতিক সংগঠনসমূহ জড়িত। প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সরকারের ভর্তুকি কমানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে এবং বিভিন্ন পলিসি যেমন, পিআরএসপি, পিসিআই ইত্যাদি আরোপ করে তাদের নিজস্ব প্রেসক্রিপশন গরিব দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। যাহোক বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখা যাক।

৭। বাজার নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সাম্প্রতিক সময়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের সরকারগুলোর জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। হুট করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতি এখন একটা বড় উদ্বেগের কারণ। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির মূল কারণ। ভোক্তা মূল্যসূচকে কী হারে বৃদ্ধি ঘটল, তার ভিত্তিতেই নির্ণয় করা হয় মূল্যস্ফীতির হার। বাংলাদেশের মতো দেশে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের তালিকায় খাদ্যসামগ্রীর গুর"ত্ব অনেক বেশি। অর্থাৎ একজন ভোক্তার ভোগের ঝাঁপিতে খাদ্যসামগ্রী ব্যয়ের প্রধান অংশ। ধনী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভোগসামগ্রীর জন্য ব্যয়ের অংকে খাদ্যসামগ্রীর হিস্যা খুবই নগন্য। দেশে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির উদ্ভব ঘটলেও মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরা

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। নিত্যপণ্যের মধ্যে চাল, গম, আটা, ময়দা, ভোজ্যতেলের বিপণন, মজুদ ও বাজারমূল্য পরিস্থিতির ওপর নজর দিলে আমরা দেখতে পাই যে, এসব পণ্যের বাজার দর অতিমাত্রায় উঠানামা করছে। এটা সত্য যে, আন্তর্জাতিক বাজারে দর বৃদ্ধি পেলে কিছু পণ্যের বিশেষ করে আমদানি নির্ভর পণ্যসমূহের খানিকটা দর বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দেখা যায় যে, হঠাৎ করে কোনো উপলক্ষ ছাড়াই এ সকল নিত্য পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধিতে দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণির অতিমুনাফা করার মনোবৃত্তি অন্যতম কারণ। এ ধরনের হীন প্রচেষ্টা রুখতে সরকারকে ক্রমাগত হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সারণি ১

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর বৃদ্ধির হার

পণ্যের নাম	সাম্প্রতিক মূল্য* টাকায়/ প্রতিকেজি	এক বছর পূর্বের মূল্য	বাৎসরিক মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি %
চাল (মোটা/স্বর্ণা/ইরি)	৩১-৩৪	২১-২৩	+৪৭.৭৩
আটা	২৮-৩২	১৯-২২	+৪৬.৩৪
ময়দা	৩৪-৩৮	২৭-৩২	+২২.০৩
সয়াবিন তেল খোলা	৯৮-১০০ (লিটারপ্রতি)	৭৫-৭৮	+২৯.৪১
পামওয়েল খোলা	৮৮-৯০ (লিটারপ্রতি)	৫৯-৬২	+৪৭.১১
মসুর ডাল	৭৪-১০৫	৮৫-১১৬	-১০.৯৫
আলু	১৮-২০	২৭-২৮	-৩০.৯১
পেঁয়াজ	৪০-৪৫	২৮-৪৪	+১৮.০৬
রসুন	১৪৫-২০০	৮০-১০৫	+৮৬.৪৯
হলুদ	২৯০-৩৪০	১৩০-১৫০	+১২৫
আদা	১০০-১৮০	৫০-৮০	+১১৫.৩৮
মুরগি (ব্রয়লার)	১১০-১২০	৯০-১০০	+২১
চিনি	৫৪-৫৬	৫২-৫৪	+৩.৭৭

উৎস: বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা সেল, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ। *টিসিবি কর্তৃক প্রকাশিত ১২ নভেম্বর ২০১০ তারিখের বাজার দর অনুযায়ী।

সারণি ১ থেকে দেখা যায়, নিত্য পণ্যসামগ্রীর মধ্যে গত এক বছরে বেশিভাগের দাম বেড়েছে। এক বছরে আটার দাম বেড়েছে ৪৬ শতাংশ পর্যন্ড়। সরকারি হিসাবেই এক বছর আগে খোলা আটার কেজি ছিল ১৯ থেকে ২০ টাকা, তা বিক্রি হয়েছে ২৮ থেকে ৩২ টাকা দরে। অর্থাৎ ভোক্তাকে এক বছরে আটা কেনায় বাড়তি গুনতে হয়েছে প্রতি কেজিতে ১০ টাকা। আর ময়দার দাম খোলা অবস্থায় ৩৩ থেকে ৩৪ টাকা এবং প্যাকেটজাত ৩৭ থেকে ৩৮ টাকা। এক বছরে দর বৃদ্ধি ১৬ থেকে ২১ শতাংশ। খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইউক্রেন, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে গম আমদানি করে বাংলাদেশ। বছরে সরকারিভাবে তিন লাখ টন এবং বেসরকারিভাবে আমদানি হয় ৪০ লাখ টন গম।

সম্প্রতি ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মূল্য পরিস্থিতি উপস্থাপন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে। এতে বলা হয়েছে, আমদানি ঋণপত্র (এলসি) অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ড় প্রতি টন গমের দাম পড়ে ২৪৮ ডলার। পাঁচ শতাংশ মুনাফাসহ এ দাম ২৬০ ডলার বা ১৮,০৮৪ টাকা। টিসিবির হিসেবে পরিবহন, গুদামভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রতি টনে ৯০০ টাকার বেশি হয় না। সে হিসাবে প্রতি টনের দাম পড়ে ১৮ হাজার

৯৮৪ টাকা, আর কেজি হিসাবে যা ১৮ টাকা ৯৮ পয়সা। গমকে আটায় রূপান্তর করায় কিছুটা ঘাটতি হয়। ওই ঘাটতি ধরে হিসাব করলে কেজিতে আরও এক টাকা করে বাড়বে, অর্থাৎ ২০ টাকা হবে। অথচ এই গমই আটা হয়ে খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২৮ থেকে ৩২ টাকা কেজিতে। এ থেকে বোঝা যায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে অনিয়ম হচ্ছে।

এখানেই বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আসে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দ্রব্যমূল্য সহনশীল পর্যায়ে রাখার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে- যেমন বিনিয়োগকারী এবং আমদানিকারকদের সুবিধার্থে ব্যাংকের সুদের হার কমানো হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে বন্দরে শুল্কায়ন পদ্ধতি, কিছু কিছু পণ্যের দাম কমাতে রাজস্ব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকি সম্প্রতি টাস্কফোর্স গঠন করে বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় দায়িত্ব ও এখতিয়ার অনুযায়ী চাল ও গমের মূল্য স্থিতিশীল রাখার অংশ হিসেবেই ওএমএস চালু করা হয়েছে। স্বল্প আয়ের মানুষের সুবিধার্থে সারাদেশে ন্যায্যমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি। নিত্যপ্রয়োজনীয় ৩টি পণ্য চিনি, সয়াবিন তেল ও মসুর ডাল টিসিবি'র নির্ধারিত ডিলারদের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের জন্য তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করছে সরকার। ইতিপূর্বে বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) বাজার ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষের জন্য ডাল ভাত কর্মসূচি পালন করেছে। ডাল ভাত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। বিডিআর এ কর্মসূচি পালন করার জন্য ঢাকায় ১০০টি আউটলেটসহ সারাদেশে ২১০টি ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে বাজার দরের তুলনায় (তিন চতুর্থাংশ) কম দামে চাল ও ডাল সরবরাহ করা হতো। বিডিআর আউটলেটগুলোতে নিম্নবিত্ত মানুষ (রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, গার্মেন্টকর্মি, বস্তিবাসী) ছাড়াও নিম্নমধ্যবিত্ত (সরকারি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক, নিরাপত্তাকর্মি) মানুষদেরও ভিড় করতে দেখা গেছে।

কিন্তু এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও পণ্যের মূল্য কমাতে সরকার বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী, নিত্যপণ্যের মধ্যে চাল ও আটার দাম স্থিতিশীল রাখার দায়িত্ব খাদ্য মন্ত্রণালয়ের। শুধু দাম স্থিতিশীল রাখা নয়, সরকারি গুদামে এ দুই পণ্যের সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে বাজারদরের চেয়ে কিছুটা কমিয়ে জনগণের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করাও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কার্যপ্রণালি বিধিতে বলা আছে, ধান, চাল, গম ও ভুট্টা-এ চারটি পণ্যের সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বিতরণ, মূল্য পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং এ পণ্যগুলোর ব্যাপারে পরিকল্পনা, গবেষণা ও তদারকির কাজ করবে খাদ্য মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে কার্যপ্রণালি বিধিতে দ্রব্যমূল্য বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজের মধ্যে এক জায়গায় বলা আছে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। অন্য জায়গায় বলা আছে, আমদানি বাণিজ্যের নীতি প্রণয়ন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। বাণিজ্য সংগঠনগুলো যেহেতু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত, সেহেতু মূল্য পরিস্থিতি সহনশীল পর্যায়ে রাখতে তাদেরই রয়েছে বেশি ভূমিকা।

বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের দাবি উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বাজার অর্থনীতি চালু রেখে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ করা কি সম্ভব?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের সরকারগুলো নব্বইয়ের দশক থেকে মুক্তবাজার নীতি গ্রহণ করেছে। দিনের পরদিন এ নীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন খাতকে পর্যায়ক্রমে বেসরকারি বা ব্যক্তিখাত নির্ভর করে তোলা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্যক্তিখাতে

বিনিয়োগকারীদের সর্বদা মুনাফা সর্বোচ্চকরণ কেন্দ্রিক চিন্ড়াচেতনা, মুক্তবাজার অর্থনীতি তাদেরকে এ সুযোগ দেওয় বা অন্য অর্থে মুক্তবাজারের দুর্বৃত্তায়ন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আসজাদুল কিবরিয়া তার কলামে লিখেছেন– "আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে সরকার তথা রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপের সামর্থ্যহীনতা দেখেছি ও দেখছি। চাল-ডাল-তেল-নুনের বাজার দর স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি কিছুটা হলেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না টিসিবিকে দুর্বল করে রাখার কারণে। তাই আমজনতাকে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় ব্যবসায়ীদের মর্জির ওপর। যারা ভোক্তা স্বার্থ বা অধিকারের ধার ধারেন না এবং রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ বা তদারকিকে আমলে নেন না (সূত্র : প্রথম আলো, পৃষ্ঠা-১৩, ৭ জুলাই-২০০৯)। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের এ ধরনের একচেটিয়া, মুনাফাকেন্দ্রিক চিন্ড়াচেতনা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে বাজারকে দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রকে তারা কোনোভাবেই হস্ড়ক্ষেপ করতে দিতে চায় না, চায় না জনসেবার কোনো সুযোগ রাখতে। অথচ মুক্তবাজার মানেই যা ইচ্ছে তা করার বাজার নয়। এখানে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা থাকবে, প্রয়োজনে রাষ্ট্র হস্ড়ক্ষেপ করবে এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রীয় খাত কোনোভাবেই অবহেলিত হবে না। এটা সত্য যে, ব্যবসায় বা পুঁজির ধর্মই হলো মুনাফা সর্বোচ্চকরণ। পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা তাদের পুঁজির উন্নয়ন করবেন এটাই স্বাভাবিক। জনগণের সামর্থ্য বা দুর্ভোগ দেখার বিষয় তাদের নয়। কিন্তু রাষ্ট্র একটি সামাজিক ও কল্যাণমূলক সংগঠন। বাজার ব্যবস্থার একচেটিয়া আগ্রাসন থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা তাই রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতভাবে রাষ্ট্রের হস্ড়ক্ষেপ কতটুকু কার্যকর কিংবা রাষ্ট্র কি আসলেই ক্ষমতাহীন হয়ে যাচ্ছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

৭.১। বাজার ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র

প্রথমত, সাধারণভাবে বলা যায় পুঁজিপতি তথা ব্যবসায়ীরা দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন। বাংলাদেশকে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে ঘাটতি মেটাতে হয়। এখন তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে প্রতি মুহূর্তে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি অবলোকন করা সম্ভব। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের বাজার যেসব ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ করেন তারা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববাজারে দামের প্রবণতা লক্ষ করে অভ্যন্ড়রীণ বাজারে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করেন, যদি তারা দেখতে পান বিশ্ববাজারে দাম আরও চড়া হবে তাহলে দেশের বাজারে সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে তারা মুনাফার অংক বাড়িয়ে নেন। বর্তমানে বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্ডিকেট (চক্র) গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম বাড়াচ্ছেন এটা বহুল আলোচিত কথা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের মূল সরবরাহকারীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। এক ধরনের Oligopoly গড়ে উঠেছে। এখানে বড় বড় আমদানিকারক রয়েছেন। এরা যে বড় আমদানিকারক ও জোগানদার হয়ে উঠেছেন তা একদিনে হয়নি। এরা পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা করেছেন ও মুনাফা তুলেছেন। সেখান থেকে আবার বিনিয়োগ করেছেন ও ব্যবসা বাড়িয়েছেন। এভাবে বড় পুঁজির শক্তি বেড়েছে। এ বড় বড় আমদানিকারকরা আমদানির বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটাই বাস্ড়বতা। আবার দু একটি পণ্যের আমদানিকারকও সীমিত। যেমন ভোজ্যতেল, যে সকল আমদানিকারকের পরিশোধনাগার কল বা মিল রয়েছে মূলত তারাই অপরিশোধিত ভোজ্যতেল আমদানি করে কারখানায় শোধনের পর বাজারজাত করেন। এখানে এদের বড় বিনিয়োগ করতে হয়েছে। অল্প কয়েকজন বিনিয়োগ করায় স্বাভাবিক

নিয়মেই বাজারে ভোজ্যতেলের যোগান তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই তাদের হাতে। সরকারের দাম কমানো বা কম মুনাফা করার আহ্বানে এরা ইচ্ছে হলে কর্ণপাত করছেন আবার ইচ্ছে না হলে করছেন না। সরকারের হাতে যদি মজুদ ভালো থাকে, তাহলে ব্যবসায়ীরা চাপের মধ্যে থাকে। এরকম কোনো চাপ সরকার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন সরকারকে উচ্চমূল্যে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। জনগণকে সহনীয় মূল্যে এ খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হলে বিপুল অংকের ভর্তুকি দিতে হবে এবং বাজেটের ওপর বড় রকমের চাপ সৃষ্টি হবে।

প্রাইভেটাইজেশনের নামে সরকারও এ সকল খাতে বিনিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং বলা যায় মুক্তবাজার অর্থনীতি তথা বিশ্বায়নের বাজার ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা সীমিত। যেহেতু সরকার পুঁজি বিনিয়োগ করছে না তাই সরকারকে পুঁজিপতিদের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

৭.২। দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনা

১৯৫৩ সালে দেশে খাদ্যপণ্যের বাণিজ্য করতে হলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়ার বিধান ছিল। ফুড স্টক অ্যান্ড প্রাইস কন্ট্রোল অ্যাক্ট ১৯৫৩ অনুযায়ী এ লাইসেন্স দেওয়া হতো। এ অ্যাক্টে আমদানিকারক, উৎপাদক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা কোনো পণ্য কতদিন মজুদ রাখতে পারবে এর বিধান ছিল। ১৯৯২ সালে মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে সরকার এ আইন বাতিল করে। সুতরাং দেশের প্রচলিত আইনে পণ্যের দাম নির্ধারণ ও মজুদের বিষয়ে কোনো ধারা নেই। কোন আইনী ভিত্তি না থাকলেও সরকার বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দাম নির্ধারণ করে চলেছে। কিন্তু সরকার যতবার কোন পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে গেছে, ততবারই দাম বেড়েছে। পণ্যের চাহিদা, যোগান ও সরবরাহ পদ্ধতির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে শুধু দাম নির্ধারণের পদক্ষেপ নেওয়ায় কোনো সুফল আসেনি। সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ-নীতিও যুৎসই না। ফলে লক্ষ্যানুযায়ী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যায়নি। এ কারণেই বোরো ফসলের ভালো ফলন সত্ত্বেও বাজারের ওপর তার কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি (সূত্রঃ প্রথম আলো, পৃষ্ঠা-১, ২৯ সেপ্টেম্বর-২০০৯)।

৭.৩। বাজার ব্যবস্থা নিয়ে পরিকল্পনার অভাব

সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। যেমন, রমজান মাসে বাংলাদেশে বাজার অস্থিতিশীল থাকে। এটা গত কয়েক বছর থেকেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ জানা বিষয়কে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে না পারা সরকারের বড় ব্যর্থতা। এবং বাজার পরিকল্পনায় সরকারের যথেষ্ট অবহেলা রয়েছে- এটাই প্রতীয়মান হয়। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, 'রমজান মাসে নিত্যপণ্যের চাহিদা বাড়ে। সেই চাহিদা বাজারের বিদ্যমান বিকৃতি, কিছু ব্যবসায়ীর বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, আন্তর্জাতিক বাজার ও শুল্ক পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে সরকারের সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাব দীর্ঘদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে। এটা সামগ্রিকভাবে সরকারের বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা।

প্রায় ৮ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদের পরও বিশ্ববাজার থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন গম ও চাল কেনার খবরে বোঝা যায়, সরকার মজুদ বাড়াতে ব্যগ্র। সরকার দেশের ভেতর থেকেও খাদ্যশস্য তথা ধান-চাল ও গম সংগ্রহ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক যে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে আগ্রহী

হলেও খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে সরকার আগের মতোই ব্যর্থ। মজুদ বাড়াতে সরকার বিদেশ থেকে গম ও চাল কিনতে উদ্যোগী হয়েছেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো দেশের কৃষকদের কাছ থেকে সরকার কেন চাল-গম কিনতে পারেনি। কৃষক তার উৎপাদিত ফসল যে বিক্রি করেনি, তা নয়। আমাদের অধিকাংশ কৃষককে বরং ঋণ পরিশোধসহ নানা ব্যয় নির্বাহে দ্রুতই ফসল বিক্রি করে দিতে হয়। ধান-চালের দাম বেড়ে ওঠার সময় তারা এর সুফল পায় না মূলত এজন্য। ধান-চাল মজুদ করে রাখতে সক্ষম ধনী কৃষক ও চালকল মালিকরাই ওই ফায়দা নেয়। যতই দিন যাচ্ছে, এ ব্যবধান আরও তীব্র হচ্ছে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কৃষি অর্থনীতিতে মেরুকরণই ঘটাচ্ছে না– থেকে থেকে খাদ্যশস্যের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার কারণও হয়ে উঠেছে এটা। চালের বাজারে বাড়ছে মজুদদারদের দাপট। মজুদবিরোধী আইন, কর্তৃপক্ষের অনুরোধ বা ধমকেও সুফল মিলছে না এক্ষেত্রে। এ অবস্থায় ধান-চালের উৎপাদন কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে মজুদদারদের হয় পোয়াবারো। 'বাম্পার ফলনের' সময়ও নাকি সন্তোষজনক উৎপাদন হচ্ছে না সাম্প্রতিক বছরগুলোয়। বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, সরকারের কাছে হালনাগাদ তথ্য না থাকায় এক্ষেত্রেও হিসাবে গরমিল হচ্ছে। কিন্তু এর প্রভাব গিয়ে পড়ছে চালের বাজারে।

চালের দাম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ছিল বর্তমান সরকারের একটি প্রধান অঙ্গীকার। কিন্তু আগের মেয়াদের মতো এক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারছেন না তারা। সরকারের হাতে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ থাকলে বাজারকে যেটুকু প্রভাবিত করা সম্ভব, সেটুকুও নাকি করতে পারছেন না তারা। ভালো হতো সরকার দেশের কৃষকদের কাছ থেকেই পরিকল্পনামতো ধান-চাল ও গম সংগ্রহ করতে পারলে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতে উৎপাদিত ফসল তুলে দিত না কৃষক। ভালো দামও পেত। তা যখন সম্ভব হয়নি, তখন মজুদ বাড়াতে বিশ্ববাজার থেকেই চাল-গম সংগ্রহ করতে হবে। বিশ্ববাজারে গমের দাম এখন ক্রমেই বাড়ছে। দাম যখন কম ছিল, তখন গম সংগ্রহের তাগিদ দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট অনেকে। তখন গা না করা সরকারকে এখন উচ্চমূল্যে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে। জনগণকে সহনীয় মূল্যে এ খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে হলে বিপুল অংকের ভর্তুকি দিতে হবে এবং বাজেটের ওপর বড় রকমের চাপ সৃষ্টি হবে। ফলে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির ওপরও চাপ বাড়বে। গণখাতে কর্মসংস্থান চাপের মুখে পড়বে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।

৭.৪। দুর্বল টিসিবি

স্বাধীনতার পরে ভোগ্যপণ্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাঁচামালের ব্যাপক ঘাটতির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ৬৮, ১৯৭২ এর বলে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিসিবি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের স্থিতিশীল যোগান নিশ্চিত করা। যাতে ভোক্তারা যথাযথ মূল্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে পারে। এক নজরে টিসিবির কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১. সময়ানুযায়ী জনগণের চাহিদা পূরণে সরকারের নীতি অনুসরণ করে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া।

২. এ উদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং সেজন্য ডিলার বা এজেন্ট নিয়োগ করা।

এছাড়া ১৯৯০ সাল থেকে সরকারের পক্ষ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্থানীয় বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। রুটিন দায়িত্ব হিসেবে টিসিবি প্রতিদিনকার বাজার মনিটর করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর সংশিণ্টষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে টিসিবি উলেণ্টখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলে টিসিবির কার্যক্রমকে সঙ্কুচিত করা হয় ১৯৮৯ সালে। এরপর ক্রমশ টিসিবি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে। নিজ থেকে পণ্য আমদানির সক্ষমতাও খুব একটা নেই সংস্থাটির। এখন তারা মূলত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কিনে বাজারে ছাড়ে। পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরাও চায় না টিসিবি বেশি পরিমাণে পণ্য বাজারে ছাড়ুক। সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় খাত মারাত্মকভাবে অবহেলিত। পুঁজির দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ নিয়ে মহল বিশেষ রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে কার্যকর কিংবা শক্তিশালী হতে দিচ্ছে না। কারণ টিসিবি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের খায়েশ পূর্ণ হবে না। এটাই স্বাভাবিক। যাহোক টিসিবি যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ দিচ্ছে তা একেবারেই নগণ্য। এসব পণ্য মোট চাহিদার অতি সামান্য অংশ মেটাতে সক্ষম, এতে দামের ক্ষেত্রে বাজারে তেমন প্রভাব ফেলতেও তাই অক্ষম।

৭.৫। বাজার তদারকির ধরন এবং স্বচ্ছতার অভাব

বিশেষজ্ঞরা বলেন, সরকারের বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বেশিরভাগ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে খুচরা পর্যায়ে। অথচ অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে আমদানি ও পাইকারী পর্যায়ে। কি পরিমাণ পণ্য আমদানি হয়েছে কি দামে আনা হয়েছে, মজুদ পরিস্থিতি কি এর যথাযথ হিসাব বা তথ্যের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতার খুব অভাব রয়েছে। সরকারের বাজার তদারকের বাস্ড়বতা হচ্ছে বাজারে বাজারে ঘুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলা মুনাফা কম করার পরামর্শ দেওয়া। যাহোক তদারকের নামে সরকারের বাজারে বাজারে সভা করা থেকে খুব সুফল পাওয়া যায়নি। ফলে কোনো পণ্যের দাম কত হওয়া উচিত তার কোন ধারণাও ভোক্তাদের কাছে নেই। এমনকি আগে আন্ড়র্জাতিক বাজার দর প্রচারের একটি ব্যবস্থা ছিল টিসিবির ওয়েবসাইটে। সেটিও এখন আর নেই।

৭.৬। যোগান শৃঙ্খলের অপতৎপরতা : মধ্যস্বত্বভোগী

মধ্যস্বস্ড়ভোগীদের কারণে পণ্যমূল্যের দাম বাড়ছে- এটি একটি বহুল উচ্চারিত কথা। আসজাদুল কিবরিয়া যোগান শৃঙ্খলের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন। (সূত্র : প্রথম আলো, পৃষ্ঠা ১৩, ১৭ আগস্ট ২০০৯) যোগান-শৃঙ্খলে পরস্পর নির্ভর কয়েকটি অংশ থাকে। সাধারণভাবে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে যোগানের শৃঙ্খল মোটামুটিভাবে এ রকম : কৃষক-সংগ্রাহক-কমিশনভোগী-বেপারী-কমিশনভোগী-পাইকার-খুচরা বিক্রেতা-ভোক্তা। আমদানির ক্ষেত্রে কৃষকের ও সংগ্রাহকের জায়গায় আমদানিকারককে পাওয়া। কিন্তু পরের স্ড়রগুলো মোটামুটি একই রকম থাকে। কখনো কখনো এ স্ড়র বা ধাপ কয়েকটি হয় কখনো বা দুই-তিনটি। তবে মধ্যবর্তী পর্যায়ে যারা থাকে তারা আমদানিকারকের সঙ্গে পাইকারের যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করে। আর তাই আমদানি কারক থেকে মূল পাইকারের কাছে পৌঁছতে কয়েক হাত ঘুরতে হয়। তবে তা কাগজে। কারণ পণ্য পাইকারের আড়তে কিন্তু এর মধ্যে চালান-নির্দেশনা (ডেলিভারির অর্ডার বা ডিও) একাধিক হাত ঘুরে। যাদের হাতে হাতে ডিও ঘোরে তাঁদের কমিশনভোগী

ও ট্রেডার যাই বলা হোক না কেন, তাঁরা এ যোগান-শৃঙ্খলের অংশ। এভাবে এক স্ড়র থেকে অন্য স্ড়রে যাওয়ার সময় পণ্যের দাম বাড়ে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তিদের মুনাফা তোলার প্রবণতায়। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা পণ্যের যোগান প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত বা প্রলম্বিত দুই-ই করতে পারে। অন্যদিকে পাইকারী থেকে খুচরা পর্যায়ে যেতেও কখনো কখনো একাধিক হাত ঘুরে যায়। তবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতি ও স্থানের ওপর। সুতরাং মূল গোলমালটা দেখা যায় যোগান-শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী জায়গায়। আর এর প্রভাব পড়ে পাইকার থেকে খুচরা সব পর্যায়েই। এর ফলে কখনো যৌক্তিকভাবেই দাম বাড়ে। আবার কখনোবা পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা সুযোগ নেন। বিশেষ করে মজুদ ধরে রেখে দাম বাড়ানোর চেষ্টা একটি পুরনো চর্চা।

৭.৭। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের করণীয়

বাজারদরের অস্থিরতা এবং অপ্রতিরোধ্য বাজার ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সন্দেহ নেই সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। পুঁজিবাদীদের মুনাফা সর্বস্ব চিন্ড়াচেতনা থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে অর্থবহভাবে বাজারে হস্ড়ক্ষেপ করতে হবে। বাজার হস্ড়ক্ষেপের জন্য সরকারের থাকতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক বাজার নিয়মিত ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেশে পণ্যের মজুদ, চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য রাখা। পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, আন্ড়র্জাতিক বাজারদর, খুচরা পর্যায়ে কতটা অযৌক্তিক দাম রাখা হচ্ছে, উৎসকেন্দ্র থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ড় আসতে কয়টি ধাপ পেরোতে হয় ইত্যাদি বিষয় যাচাই করা। এসব তথ্য থাকলে সহজেই বোঝা যাবে বাজারের অবস্থাটা কি? পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে চাহিদা বৃদ্ধির আগাম ধারণা বিবেচনায় নিয়ে চার-পাঁচ মাস আগে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা জর"রি। মজুদ পরিকল্পনা সরকারকেই করতে হবে।

এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের জন্য কয়েকটি নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন। এগুলো হলো কোন পর্যায়ে কত লাভ করা যাবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। মৌসুমি ব্যবসায়ীরা যাতে বাজার প্রভাবিত করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ধান-চাল ও গম মজুদ রাখা, খাদ্যশস্যের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশ না করার ব্যাপারে গণমাধ্যমের সহায়তা নেওয়া, খাদ্যশস্যের চাহিদা ও উৎপাদনের ভিত্তিতে সরবরাহের ব্যাপারে সরকারকে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং পণ্য পরিবহনে নৌ ও রেলপথের অবকাঠামো উন্নয়ন করা। সরবরাহ আদেশ (ডিও) প্রথা বন্ধ করা। এটি একটি বড় চক্র। ডিও বিভিন্ন হাত ঘুরে ঘুরে পণ্য মূল্য বাড়াতে ভূমিকা রাখে। মোড়কজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য, পরিমাণ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উলেণ্টখ থাকতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবসায়ীদের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া এবং এ ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তদারক দলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া ।

এ প্রস্তুতির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার স্বার্থে টিসিবিকে শক্তিশালী করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে টিসিবিকে সক্রিয় করা হবে বলে বারবার ঘোষণা দেয়া হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। টিসিবিকে নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, এর সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া সরকারের কোনো বিকল্প নেই। তবে টিসিবিকে প্রথাগত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে না রেখে ব্যক্তি খাতকে সম্পৃক্ত করে গতিময়তা আনার চেষ্টা করা উচিত। এজন্য প্রয়োজনীয় লোকবল এবং পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আন্ড়র্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে সীমিত আকারে হলেও সরকারের নিজস্ব মজুদ ও যোগান প্রক্রিয়া গড়ে

উঠবে। তখন বাজারে কোনো অস্থিরতা দেখা দিলে এ মজুদ থেকে পণ্য যোগান দিয়ে বাজারে স্থিতিশীলতা আনা অনেকটাই সহজ হবে। কারণ ব্যবসায়ীরা যখন জানবে সরকারের বাজারে হস্তক্ষেপ করার সামর্থ্য আছে তখন তারাও বেশি দর কষাকষি করতে পারবে না। কারণ পণ্য ধরে রাখার যে খরচ, তা তুলতে না পারলে খুব দ্রুতই তা ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হবে। টিসিবি'র হাতে মজুদকৃত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। টিসিবি'র ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করছে ডিলারদের উপর। ডিলাররা ঠিকমতো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা কঠোরভাবে নজরদারি করতে হবে। ডিলাররা যেন বেশি মুনাফার আশায় পাইকারী বাজারে পণ্য বিক্রি না করেন তা তদারকি করতে হবে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি (কমান্ড ইকোনমি) ছাড়া নির্ধারণ করে দিয়ে কোনো পণ্যের দাম কমানো যাবে না। মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় তাই বাজারের নিয়মেই দাম কমাতে হবে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলোকে উৎপাদন বা আমদানি থেকে শুরু করে বাজারের প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গুদামের অভাবে কৃষকরা উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ করতে পারছে না। ফসল উৎপাদন করেও তারা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে খাদ্যগুদামের সংখ্যা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বাজার পরিস্থিতির উন্নয়নে সমবায়কে কার্যকর করা যেতে পারে। কেউ পণ্য মজুদ করে বাজার অস্থিতিশীল করতে চাইলে বা পণ্যের কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান বিশেষ ক্ষমতা আইনে আছে। সরকারকে অবশ্যই এ আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

৮। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মৌলিক পুনর্গঠন এবং নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্ন

মুক্তবাজার, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং উন্মুক্ততা, লাগামহীন বেসরকারিকরণ, বি-নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যপুঁজির অবাধ প্রবাহ, এগুলোই আজকের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সমার্থক। এর পেছনে রয়েছে বহুজাতিক পুঁজি এবং বাজার সম্প্রসারণ কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা। বহুজাতিক পুঁজি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার জটিল ও গতিশীল সম্পর্কের মধ্যদিয়েই বিশ্বায়নের আকার, পরিধি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এটা সত্য, বর্তমান পর্যায়ের বিশ্বায়ন রাষ্ট্রের কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না। বাণিজ্যের উদারীকরণ, বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি ও শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র কার্যকরভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। যাহোক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সংঘটনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যকর সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আদতেই বহুজাতিক পুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্রের একটি দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। যেহেতু রাষ্ট্র ও পুঁজি এ দুটি সত্তার যৌক্তিক অবস্থান ভিন্ন, তাই এ দুয়ের দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়ার নয়। বহুজাতিক পুঁজির একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা অর্জন আর রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে নাগরিকদের চাহিদা পূরণ করা। কিন্তু বহুজাতিক পুঁজি এবং তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্বসংস্থাসমূহের (IMF, WB, WTO) বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। রাষ্ট্র চাইলেই এ সকল বিশ্বসংস্থা এবং এদের বাণিজ্যনীতিকে উপেক্ষা করতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে এ বিশ্বায়নকে মেনে নিতে গরিব রাষ্ট্রগুলোকে বাধ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করার মধ্যদিয়ে উন্নয়নশীল ও উত্তরণশীল ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিল সেসব দেশকে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অধীনে নানা ধরনের কঠিন শর্তের জালে আটকে তাদের নিজ নিজ বাজার উন্মুক্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং এর মধ্যদিয়ে বহুজাতিক এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজিপতিদের স্বার্থের ও

পুঁজির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশ্বায়ন এভাবে আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যবস্থাপক ও তাদের স্থানীয় দোসরদের সামনে ফটকাবাজির অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে এটি দরিদ্রমুখী ও পুন:বণ্টনমূলক জননীতির ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রসমূহ তার কল্যাণমূক ব্যয় সঙ্কুচিত করছে।

অবস্থাদৃষ্টে এ ভাবনার উদ্রেক করা অসমীচীন নয়, রাষ্ট্রসমূহ পুঁজিপতিদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। বেসরকারিকরণ, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, দেশীয় শিল্পের মৃত্যু, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাব-কন্ট্রাকটিং এসবের ফলে শ্রমজীবী মানুষের দর কষাকষির ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অর্থনীতিকে আমদানি নির্ভর করা হচ্ছে। জাতীয় সম্পদ (গ্যাস, তেল, কয়লা ও স্বর্ণ) রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জনগণের আশা আঙ্ক্ষার প্রতিফলক না হয়ে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করছে।

৯। উপসংহার

বাজার ব্যবস্থার প্রসার ও সম্প্রসারণ, বাণিজ্যে ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা - পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বশেষ সংস্করণ যা অন্য অর্থে বিশ্বায়ন নামে অভিহিত। কাঠামোগত সংস্কার তথা বাণিজ্য উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় বাধা ধীরে ধীরে উঠে যেতে শুর“ করায় অবাধ বৈশ্বিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। গত দশক কিংবা তারও বেশি সময় জুড়ে জাতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ, আধিরাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব, উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও ব্যবস্থার জোয়ার এবং বিশ্বজুড়ে ভোক্তা সংস্কৃতির গঠন বিভিন্নভাবে পুরো বিশ্বকে অনেকটা একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়ার দিকে ধাবিত করেছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের প্রভাব, প্রশ্নাতীতভাবে জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করেছে কিংবা জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমিত করেছে। স্বাধীনভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ ও বাস্ড়বায়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং বাজার ব্যবস্থার তদারকি বা হস্ড়ক্ষেপে রাষ্ট্রের ভূমিকা আজ নতজানু। তারপরেও বিশ্বায়নের কারণে রাষ্ট্রসমূহের দুর্বল হওয়ার মানে এ নয় যে, সকল জাতীয় সরকার নিজেদেরকে পুরোপুরি ক্ষমতাহীন ভাবতে পারে। রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বময় সত্তা হিসেবে আছে এবং থাকবে। বস্তুত যদি রাষ্ট্রের স্বীকৃত কার্যাবলী আলোচনা করা হয় তবে দেখা যায়, উন্নয়নের একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ রাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের ঘাড়েই বর্তায়। রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপমাত্রই খারাপ আর বাজার হলো অপ্রতিরোধ্য ধারণার বিপরীতে খুঁজে দেখা হয়েছে, কি ধরনের কৌশল, নীতিমালা ও আইন-কানুন প্রণয়ন করলে বাজার এবং রাষ্ট্র উভয়কেই গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক করা যায়; কেননা নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য এটা খুবই গুর“ত্বপূর্ণ। বাজারদরের অস্থিরতা এবং অপ্রতিরোধ্য বাজার ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সন্দেহ নেই সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। পুঁজিবাদীদের মুনাফা সর্বস্ব চিন্ড়াচেতনা থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে অর্থবহভাবে বাজারে হস্ড়ক্ষেপ করতে হবে। বাজার হস্ড়ক্ষেপের জন্য সরকারের থাকতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার নিয়মিত ভিত্তিতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেশে পণ্যের মজুদ, চাহিদা ও যোগান সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য

রাখা। পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন, আমদানির পরিমাণ, আন্তর্জাতিক বাজারদর, খুচরা পর্যায়ে কতটা অযৌক্তিক দাম রাখা হচ্ছে, উৎসকেন্দ্র থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত আসতে কয়টি ধাপ রপরোতে হয় ইত্যাদি বিষয় যাচাই করা। এসব তথ্য থাকলে সহজেই বোঝা যাবে বাজারের অবস্থাটা কি? মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় বাজারের নিয়মেই দাম কমাতে হবে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলোকে উৎপাদন বা আমদানি থেকে শুর" করে বাজারের প্রতিটি পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকা পুনরায় শক্তিশালী করতে হবে। পাবলিক সেক্টরে সরকারি নিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্প্রসারিত করার বিষয়টি গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা দরকার যার মূল উদ্দেশ্যই হবে রাষ্ট্র এবং বাজার ব্যবস্থার কারণে সমাজের যেসব জনগোষ্ঠী প্রান্তিক অবস্থানে চলে গেছে তাদের চাহিদা সর্বাগ্রে পূরণ করা। খাদ্যের দাম বাড়লে সবচেয়ে বড় আঘাত আসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর । খাদ্যের দাম বাড়লে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি বাড়ে। গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ এফএও প্রকাশিত বাংলাদেশে খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের প্রায় ৪০ লাখ মানুষ চরম খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০ হাজার এবং সিডর ও আইলা এলাকার ৩৯ লাখ মানুষ খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। সরকারি সংস্থা পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্বব্যাংক ও বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হিসাবে ২০০৫ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশে দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তা বেড়েছে। অধিক জনসংখ্যা আর খাদ্যপণ্যের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতাকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছে সংস্থাগুলোর বিশেষজ্ঞরা। বর্তমান জনসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় অনুযায়ী খাদ্যশস্যের চাহিদা অনেক বেড়ে উঠেছে এবং এ অবস্থায় সরকারের হাতে সন্তে"াষজনক' মজুদ রাখতে হলে উৎপাদনের পরিমাণ উলেণ্টখযোগ্যভাবে বাড়াতে হবে। ধান চাষের উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। কৃষক বর্তমানে ধান চাষ করতে গিয়ে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করছে আর যে ফলন পাচ্ছে তাতে কৃষক লাভের মুখ দেখছে না। এ অবস্থা থেকে কৃষকদের বের করে নিয়ে আসা দরকার। সাবসিডি বা ভর্তুকির পাশাপাশি কৃষি উপকরণ বিশেষ করে সার, ঋণ সহজলভ্য করা দরকার, সেইসাথে উন্নত প্রযুক্তিগুলো কৃষকের জমিতে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তাহলে কৃষক যেমন জমি থেকে অধিক ফলন পাবে তেমনি কমে যাবে তার ফসলের গড় উৎপাদন খরচ।

বৈদেশিক ঋণ ও আমদানি নির্ভরশীল না হয়ে প্রাথমিকভাবে জাতীয় সঞ্চয় ও উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রসমূহ নতজানু নীতি অনুসরণের খোলস থেকে বের হয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম, এস আমিনুল (২০০৬): উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ ।

Ahmed, Sadia and Zaidi Sattar (2004*):* "Impact of Trade Liberalisation: Looking at the Evidence." *Econocmic and Political Weekly*, Sep.4.

Cutler, Ac. Haufler, V & Porter T (eds) (1999): *Private Authority in International Affairs* Newyork: University of New York.

Feigenbaum Harvey, Jeffney Hing and Chris Hamnett, (1999): *Shrinking the State: The Political Underpinnings of Privatization.* Cambridge: Cambridge University Press.

Friedman, Thomas (1999): The *Lexus and the Olive Tree Understanding Globalization*. (1999 revised ed 2000).

Fric Novdlinger (1982): On the Autonomy of the Democratic State Harvard University Press.

Fukuyama, F. (1994): *The End of History and the Last Man.* New York: The Free Press.

Huntington, S. (1991): *The Third Wave, Democratization in the Late Twentieth Century Novman*, Ok: University of Oklahoma Press.

Mark BeeSon (2003): *"Sovereignty Under siege*: *Globalisation and the State in Southest Asia".* Third World Quarterly, Vol-24, pp-357-374.

Martin, Minogue, Uma Kothari and Jocelyn Dejong (eds) (2002): *Development Theory and Practice.* London: Sage Publication.

Mittelman, J.H. (2000): *The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance.* Princeton: Princeton University Press.

Opello, Jr: W & S. Rosow (1999): *The Nation State and Global Order; A Historical Introduction to Contemporary Politics.* Boulder; Co: Lynre Rienner.

Ohmac, Kenichi (2000): *The End of the Nation State.* New York: The Free Press.

Our Global Neighbourhood (1995): *Report of the Commission of Global Governance*. Oxford University Press, New York.

Quibria, M.G. (ed.) (1997): *The Bangladesh Economy in Transition*. Dhaka: UPL.

Reinicke, W.H. (1998): *Global Public Policy: Governing without Government*? Washington, Dc: Brookings Institution Press.

Robert O Keoheme and Joseph S Nye Je. (2000): In Edited Joseph S Nye. Je. John D. Donahue, *Governance in Globalising World.* Washington D. C.: Brookings Institution Press.

Rodrik, Dani (1997): *Has Globalisation Gone Too Far*? Washington DC.: Institute for International Economics.

Sobhan, Rehman (1992): "Structural Adjustment and Macro Economic Performance." *Bangladesh Development Studies*, Vol.20, June-September.

Strange, S. (1996): *The Refreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy.* Cambridge University Press.

Thomson, J.E. (1995): *State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research*. *International Studies Quarterly*, Vol. 30.